রামানুজন, একটি প্রহেলিকা ও একটি বেদনাময় স্মৃতি

কখনও কখনও মানুষের ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় যা সাধারণ কোন নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটন বা আইনস্টাইন-এর আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি যুগান্তকারী। গণিতের ইতিহাসেও রামানুজনের আবির্ভাব এবং তিরোধান ধূমকেতুর মতো। গণিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাহীন এই তরুণ কিভাবে বছর পাঁচেকের সত্যিকার কর্মজীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গবেষণায় অতুলনীয় মেধার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা কোন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাঁর জীবন একটি সর্বকালের প্রহেলিকা।

রামানুজন একজন দরিদ্র ভারতীয়, যাঁকে অর্ধশিক্ষিত বললে তাঁর প্রতি অসম্মান করা হয় না বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ করা হয়। তিনি কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম আর্টস বা এফ. এ. পরীক্ষাও পাস করেননি। এমনকি তিনি 'অকৃতকার্য বি.এ.' তাও বলা যায় না। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আধুনিক ইউরোপীয় গণিত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিরিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান যখন এক অর্থে তাঁর গণিত শিক্ষা সবে শুরু হয়েছিল। তবু গণিতে তাঁর প্রকাশনা দিয়ে চারশ' পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পরিমাণও বিপুল, যা অতি সম্প্রতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কাজের মধ্যে অনেক কিছু সম্পূর্ণ নতুন, অনেক কিছু যা অন্যের জানা থাকলেও তিনি নিজে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। কখনও কখনও তাঁর আবিষ্কার অসম্পূর্ণ এবং এখনও ঠিক বোঝা যায় না যে, কোন কোন ব্যাপার তিনি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন এবং কোন কোন জিনিস তিনি যে কোন ভাবেই হোক শিখেছিলেন। রামানুজন কত বড় মাপের গণিতবিদ ছিলেন তা যেমন পরিমাপ করা যায় না তেমনি কত বড় গণিতবিদ তিনি হতে পারতেন তাও বলা অসম্ভব।

রামানুজনের ব্যাপারে এই অসুবিধা, তাঁকে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই ব্রিটিশ গণিতবিদ জি.এইচ. হার্ডিও অনুভব করেছেন। হার্ডি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম রামানুজনের কাজ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সে কাজের মূল্য তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। রামানুজনের বিশাল কাজের কোন কোন অংশের ওপর অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ওয়াটসন এবং অধ্যাপক মরডেল। কিন্তু তাঁরা কেউই রামানুজনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। হার্ডি তাঁর সঙ্গে কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। হার্ডি লিখেছেন যে, রামানুজনের সঙ্গে জড়িত হওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক ঘটনা এবং পৃথিবীর সবার চাইতে রামানুজনের কাছেই তাঁর ঋণ সবচাইতে বেশি।

বাংলাইন্টারনেট.কম

১৮৮৭ সালে রামানুজন কুম্বকোনামের কাছে এরোদ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় এই গ্রাম। তাঁর পিতা ছিলেন কুম্বকোনামের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী দোকান-কর্মচারী। তাঁর সব আত্মীয় উচ্চবর্ণের হলেও তাঁরা অত্যন্ত গরিব ছিলেন।

সাত বছর বয়সে রামানুজন কুম্বকোনামের হাইস্কুলে পড়তে যান। দশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার কথা সকলে জানতে পারেন এবং তাঁর এ সময়কার জীবন সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকাররা কিছু অদ্ভুত গল্প বলেন। তাঁরা বলেন যে, গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি পড়তে শুরু করে তিনি নিজেই অয়লারের সাইন ও কোসাইন উপপাদ্য (ডি-ময়ভার উপপাদ্য নামেও যা পরিচিত) আবিষ্কার করেছিলেন। পরে তিনি লোনির ট্রিগোনোমেট্রি বই থেকে বুঝলেন যে, এই উপপাদ্য আগেই জানা এবং তা তাঁকে বেশ হতাশ করেছিল। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তিনি উচ্চ পর্যায়ের কোন গণিতের বই দেখেননি। হুইটেকারের 'মর্ডান এনালিসিস' তখনও লেখা হয়নি। তিনি এই সব বই পেলে কথ ভাল হত তা কেবল কল্পনাই করা চলে। যে বইটি তিনি পেয়েছিলেন তার নাম ছিল 'সিনোপসিস', লেখক জনৈক জর্জ কার।

কার ছিলেন কেমব্রিজের একজন ছাত্র। তাঁর 'সিনোপসিস' এখন আর পাওয়া যায় না। কুম্বকোনাম সরকারি কলেজের গ্রন্থাগারে এই বইটি ছিল এবং রামানুজনের এক বন্ধু তাঁকে এই বইটি পড়তে দেন। বইটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু রামানুজনের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এই বইটি সর্বকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। কার আসলে প্রাইভেট কোচিং দিতেন এবং বইটি তাঁর কোচিং ক্লাসের জন্যই লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। এই বই-এ ৬১৬৫টি উপপাদ্যের উল্লেখ আছে যা সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। কারের বইতে উপপাদ্যগুলির প্রমাণ সেরকম বিস্তৃতভাবে নেই এবং পরবর্তীকালে রামানুজনের বিখ্যাত নোটবইতেও ঠিক একইভাবে কোন প্রমাণ ছাড়াই তাঁর আবিষ্কৃত উপপাদ্যগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রামানুজনের মতো একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বালকের অনুপ্রেরণার জন্য কারের বইটি খুব খারাপ ছিল না এবং রামানুজনের তাৎক্ষণিক তৎপরতাও ছিল বিস্ময়কর। তাঁর জীবনীকাররা লিখেছেন যে, এইভাবে তাঁর সামনে যে নতুন জগৎ উন্মোচিত হল সেখানে তিনি আনন্দের সঙ্গে বিচরণ শুরু করলেন। আর কোন বই-এর সাহায্য যেহেতু তিনি পাননি তাই প্রত্যেকটি সমাধান ছিল তাঁর এক একটি গবেষণার ফল। রামানুজন বলতেন যে, নামাক্কলের দেবী তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে ফর্মুলা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, অনেক সময় ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কিছু গণিতের ফর্মুলা লিখে ফেলতেন এবং তাড়াতাড়ি তা প্রমাণ করতেন, যদিও অনেক সময় তিনি সুচারু প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই দিতে পারেননি।

রামানুজন যে ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া ছিলেন তা কিন্তু মোটেই নয়, যদিও তিনি নামাক্কলের দেবীকে তাঁর প্রেরণার উৎস বলেছেন। তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুর পক্ষে যা কিছু করণীয় তা অবশ্যই পালন করতেন। এমনকি ইংল্যান্ডেও তিনি তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য থেকে এক চুল বিচ্যুত হননি। কেননা তিনি পিতা-মাতাকে এভাবেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের মতো শীতের দেশে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর শুধু নিরামিষ খেয়ে জীবনধারণ তাঁর পক্ষে আরো কষ্টকর হয়েছিল। তিনি নিজেই রান্না করতেন এবং ঠাণ্ডা যতই লাগুক রান্নার আগে অবশ্যই কাপড় বদলে পাজামা পরে নিতেন। কিন্তু এসবই ছিল ধর্মের প্রতি তাঁর সরল আনুগত্যের পরিচয়, কোন বুদ্ধিবৃত্তিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফল নয়। হার্ডি লিখেছেন যে, একবার তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন রামানুজনের মুখে একথা শুনে যে, সব ধর্মই তাঁর কাছে মোটামুটি একই মনে হয়— একথা তিনি অন্তর দিয়ে না বিশ্বাস করলে নিশ্চয়ই বলতেন না। কেউ যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তবে সে কথার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তবে অবশ্যই তাঁর কথা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তিনি বিশ্বাস করলে কেন সেকথা বলবেন। তাই রামানুজনের মতো একজন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি বলেন যে, তাঁর কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস নেই তবে অবশ্যই বলতে হয় যে, তিনি তাঁর অন্তরের কথাই বলেছেন।

হার্ডিকে রামানুজন একথা বললেও তিনি কখনও তাঁর পিতা-মাতা বা ভারতীয় বন্ধুদের এ ধরনের কথা বলতেন না। তিনি হার্ডির কথামতো একজন সত্যিকারের এগনস্টিক ছিলেন, যাঁর কাছে হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন ভাল বা খারাপ দিক বলে কিছুই ছিল না। হিন্দুধর্ম হল আচার-আচরণের ধর্ম, যেখানে বিশ্বাসের স্থান ততটা নয় যতটা খ্রিষ্টধর্মে রয়েছে। তাই রামানুজনের জীবনীকাররা যদি মনে করেন যে, তাঁর নামাক্কলের দেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল তবে তাঁরা যে খুব অন্যায় করেন তাও নয়। তিনি ধর্মের সব কিছুর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

রামানুজনের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একথা বলা দরকার এজন্যই যে, তাঁকে নিয়ে যে রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। হার্ডি লিখেছেন যে, 'রামানুজন যখন কেমব্রিজে বাস করতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল তখন তিনি অন্য দশ জনের মতোই যুক্তি মেনে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীর-স্থিরভাবে চলতেন এবং বিষয়-বুদ্ধিও তাঁর আর সকলের মতোই ছিল। তাঁকে প্রাচ্যের অবিনশ্বর জ্ঞানের রহস্যময় দুর্বোধ্য প্রকাশ এটা ভাবার কোনই কারণ নেই, কেননা আরো অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির মতোই তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বসে এক কাপ চা পান করা যেত এবং রাজনীতি ও গণিত নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আলাপ করা যেত। তিনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন এবং একজন বড় মাপের গণিতবিদও ছিলেন এটাই আসল কথা।'

সতের বছর বয়স পর্যন্ত রামানুজনের জীবন ভালই কাটল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন এবং জানুয়ারি মাসে কুম্বকোনামের সরকারি কলেজে ফার্স্ট আর্টস শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ইংরেজি এবং গণিতের ব্যুৎপত্তির জন্য সুব্রাহ্মনিয়ান বৃত্তি লাভ করেন।

কিন্তু এর পরেই তাঁর জীবনে কয়েকটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। এ সময়ে তিনি গণিত নিয়ে এতই আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন যে ইংরেজি, ইতিহাস, শারীরবিদ্যা যে কোন বিষয়ের ক্লাসে তিনি গণিতের কোন গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ক্লাসে কি পড়ানো হচ্ছে তার দিকে কোন খেয়াল করতেন না। গণিতের প্রতি অসাধারণ ঝোঁক এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অবহেলার ফলে তিনি পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন পেলেন না এবং ফলে তাঁর বৃত্তিও বাতিল হয়ে গেল। এ সময়ে হতাশ হয়ে কিছুদিনের জন্য তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ফিরে এসে আবার কলেজে যোগ দিলেন। যথেষ্ট হাজিরা না থাকায় ১৯০৫ সালে তিনি টার্ম সার্টিফিকেট পেলেন না। ১৯০৬ সালে তিনি মদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অসুস্থ হয়ে আবার তিনি কুম্বকোনামে ফিরে আসেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে অবতীর্ণ হন এবং পাস করতে ব্যর্থ হন।

১৯১২ সাল পর্যন্ত রামানুজনের কোন নির্দিষ্ট কাজ ছিল না— অবশ্য গণিত ছাড়া। ১৯০৯ সালে তিনি বিবাহিত হন এবং তাই তাঁর একটি নিয়মিত চাকরির প্রয়োজন হল। কিন্তু তাঁর কলেজ জীবনের ব্যর্থতার জন্য চাকরি পাওয়াও মুশকিল ছিল। রামস্বামী আয়ারের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিও তাঁর জন্য সেরকম কিছু করতে পারলেন না। ১৯১২ সালে তিনি মদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে একটি কেরানীর চাকরি লাভ করেন। এসময় তাঁর বয়স পঁচিশ এবং আর পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। আঠার থেকে পঁচিশ বছর যে কোন মানুষের জীবনে শিখবার সবচেয়ে ভাল সময়। এই সময়টাই রামানুজনের সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তবু ১৯১১ সালে রামানুজনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং পনের বছর থেকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা সকলের চোখে পড়তে থাকে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ইংরেজরাই তাঁর জন্য এসময় সত্যিকারের সাহায্যের কাজ কিছু করেছিলেন। স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং এবং স্যার গিলবার্ট ওয়াকার তাঁর জন্য বার্ষিক ষাট পাউন্ডের একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন, যা দিয়ে তিনি সস্ত্রীক মোটামুটিভাবে জীবনধারণ করতে পারতেন।

১৯১৩ সালের প্রথমে রামানুজন কেমব্রিজে অধ্যাপক জি.এইচ. হার্ডিকে তাঁর কাজ উল্লেখ করে পত্র দিয়েছিলেন এবং হার্ডি ও অধ্যাপক নেভিল বহু অসুবিধা পেরিয়ে ১৯১৪ সালে রামানুজনকে কেমব্রিজে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি তিন বছর অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুখ থেকে তিনি সত্যিকারভাবে আর কোন দিনই ভাল হতে পারেননি। এর পরেও তিনি কাজ করে গিয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতার যে হানি হয়েছিল তাও নয়। তাই ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু আকস্মিকই বলতে হয়।

১৯১৮ সালে রামানুজন রয়াল সোসাইটির ফেলো এবং একই বছরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। এই দুই সমিতিরই তিনি প্রথম ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য। মৃত্যুর দু'মাস আগে তিনি থিটা অপেক্ষক নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

রামানুজনের কাজের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে, তাঁকে কোন মানে বিচার করা যাবে এবং ভবিষ্যতের গণিতের ওপর তাঁর প্রভাবইবা কতটুকু এসব কিছু নিয়েই অনন্তকাল ধরে আলোচনা চলতে পারে। হয়তো বড় মাপের কাজের সারল্য এবং অবশ্যম্ভাবিতা তাঁর কাজে ছিল না, হয়তো তাঁর কাজ এত অদ্ভুত না হলে তা আরো বড় মাপের হত। কিন্তু তাঁর একটা গুণের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না— তা হল তাঁর গভীর এবং দুর্ভেদ্য মৌলিকত্ব। তরুণ বয়সে তাঁকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারলে হয়তো তিনি আরো বড় গণিতবিদ হতে পারতেন, অনেক কিছু নতুন এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও তিনি হয়তো আবিষ্কার করতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। কুম্বকোনামের সরকারি কলেজ তার মতো একমাত্র প্রতিভাবান ছাত্র পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি। উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার এরচেয়ে বড় উদাহরণ বোধ হয় আর নেই।

হার্ডির কাছে লেখা রামনুজনের চিঠিতে ১২০টি উপপাদ্যের উল্লেখ ছিল যা তাঁর নোটবই থেকে তুলে দেয়া হয়েছিল। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ভারতীয় কর্মচারীর কাছ থেকে এ ধরনের চিঠি পেয়ে হার্ডির কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা শুধু কল্পনাই করা যায়। এই ১২০টি উপপাদ্যের কোন কোনটি হার্ডির কাছে পরিচিত মনে হয়েছিল। কোন কোন ফর্মুলা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, রামানুজনের কাছে এ ধরনের আরো ফর্মুলা নিশ্চয়ই আছে। তবে সবগুলি সম্বন্ধেই তাঁর একথাই মনে হয়েছিল যে, একজন অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের গণিতজ্ঞের পক্ষেই এইসব ফর্মুলা লেখা সম্ভব। রামানুজনের ভারতে থাকাকালীন কাজের দুই-তৃতীয়াংশই পুনরাবিষ্কার এবং তাঁর জীবদ্দশায় এর বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়নি। প্রফেসর ওয়াটসন রামানুজনের নোটবই অনুসন্ধান করে আরো উল্লেখযোগ্য ফর্মুলা পেয়েছেন। রামানুজনের প্রকাশিত কাজের বেশির ভাগই কেমব্রিজে থাকাকালে করা। তিনি প্রচলিত অর্থে গণিতবিদ কোন দিনই হতে পারেননি। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত

বাংলাইন্টারনেট.কম

করতে তাঁর দেরি হত না। উপপাদ্যের 'প্রমাণ' বলতে কি বুঝায় তা তিনি পরবর্তীকালে বুঝতে পারতেন, যদিও তাঁর কাজের পদ্ধতি আগের মতোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্বজ্ঞাপ্রসূত ছিল। এমন মগ্নচৈতন্য তরুণ গণিতবিদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

রামানুজন গণিতে যে সব কাজ করেছিলেন সহজ ভাষায় তার পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর এক একটি উপপাদ্য তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন তা চিন্তা কররেও স্তম্ভিত হতে হয়। সংখ্যা সম্বন্ধে রামানুজনের তাৎক্ষণিক চিন্তা কিভাবে কাজ করত তার একটি সুন্দর গল্প হার্ডি বলেছেন, 'সংখ্যার খামখেয়ালীপনা তিনি অদ্ভুতভাবে মনে রাখতে পারতেন। লিটলউড বলেছিলেন, প্রত্যেকটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা রমানুজনের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিল। মনে আছে তিনি যখন পাটনিতে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন একদিন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার ট্যাক্সির নম্বর ছিল ১৭২৯ এবং বলেছিলাম যে সংখ্যাটি বোধ হয় একেবারে সাদামাটা এবং আশা করেছিলাম যে এটা কোন অশুভ সংকেত হবে না। তিনি উত্তর করলেন, না, এটা একটা অত্যন্ত মজার সংখ্যা, এটাই সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে দু'ভাবে দুটো সংখ্যার ত্রিঘাত হিসেবে প্রকাশ করা যায়। ($১৭২৯ = ১২^৩ + ১^৩ = ১০^৩ + ৯^৩$)। আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম চতুর্থঘাতের অনুরূপ সমস্যার সমাধান তিনি বলতে পারেন কিনা। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন যে, কাছাকাছি কোন উদাহারণের কথা তাঁর জানা নেই তবে তাঁর মনে হয় যে, এ ধরনের প্রথম সংখ্যাটি বেশ বড় হবে।'

বীজগণিতের নানা ফর্মুলা সম্পর্কে, অসীম সিরিজের বিভিন্ন রূপান্তরের ব্যাপারে রামানুজনের অন্তর্দৃষ্টি ছিল বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে তাঁর বোধ হয় কোন তুলনাই ছিল না। অয়লার এবং জেকোবিকে তাঁর সমকক্ষ হয়তো বলা যায়। তিনি সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণ থেকে আরোহী পদ্ধতিতে নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করতেন। এই ভাবেই তিনি সংখ্যার বিভাজন সম্পর্কে (যেমন ৪= ৩+১ = ২+২ = ১+১+১+১) তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যে উপনীত হয়েছিলেন যা গণিত ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁর স্মৃতি শক্তি, ধৈর্য এবং গণনা করার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সাধারণীকরণের ক্ষমতা, ফর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনুভব এবং অনুসিদ্ধান্ত দ্রুত পরিমার্জনের ক্ষমতা যা বাস্তবিকপক্ষে আশ্চর্যজনক ছিল এবং যার জন্যে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়ে তাঁর কোন তুলনাই ছিল না।

এইভাবে বিজ্ঞানে ইউরোপীয় মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির সঙ্গে কি করে একজন অর্ধশিক্ষিত ভারতীয় সমানে পাল্লা দিয়ে গণিতের নানা অংশে অক্ষয় চিরভাস্বর অবদান রেখে গিয়েছেন, তা ভাবলেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। নিঃসন্দেহে রমানুজন গণিতের ইতিহাসে একটি একক বিস্ময় হিসেবেই চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

বাংলাইন্টারনেট.কম

Find More Bangla Ebook @ banglainternet.com